# দুগ্ধবতী গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষন সহায়িকা

কোর্সের সময়কাল- ২ দিন

**Dr. M. Azizul Hoque Chowdhury**
**FoSHoL Project**
**Practical Action Bangladesh**
**Badarpur, Faridpur**

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| কোর্সের উদ্দেশ্য | ৩ |
| কোর্সের বিষয়সূচী | ৩ |
| কোর্সের সিডিউল | ৪ |
| গরুর জাত | ৫-৭ |
| গবাদিপশুর খাদ্য | ৭-৯ |
| গর্ভবতী গাভীর যত্ন | ৯ |
| প্রসবকালীন গাভীর যত্ন | ৯ |
| বাছুরের যত্ন | ১০ |
| গরুর বিভিন্ন প্রকার রোগ ও তার চিকিৎসা ও প্রতিকার | ১০-২২ |
| ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র প্রস্তুত ও পশুকে খাওয়ানো | ২২-২৩ |
| ইউরিয়া বিষক্রিয়া | ২৩ |
| সাইলেজ এর মাধ্যমে খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ | ২৩-২৪ |

**কোর্সের উদ্দেশ্যঃ**

১. গরুপালন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

২. দক্ষতা বৃদ্ধি।

৩. গাভীর দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

৪. লাভজনক আত্মকর্মসংস্থানের উৎস সৃষ্টি।

৫. আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি।

৬. প্রযুক্তি হস্তান্তর

৭. উৎপাদন বৃদ্ধি

৮. দারিদ্র দূরীকরণ

৯. দেশ গঠনমূলক কার্যাবলীতে মহিলাদের অংশগ্রহন।

**কোর্সের বিষয়সূচীঃ**

প্রথম দিন

১. জড়তা ভাঙ্গানো ও কোর্সের উদ্দেশ্য বর্ণনা।

২. গরুর জাত ও বৈশিষ্ট।

৩. বাংলাদেশে পালিত গরুর জাত সমূহ।

৪. গাভী পালনের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য।

৫. গরুর দানাদার খাদ্য ও ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র

**দ্বিতীয় দিন**

১. ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র প্রস্তুত (ব্যবহারিক)।

২. গরুর সাধারণ রোগ বালাই ও এর দমন।

৩. খাদ্য হিসাবে ঘাসের প্রয়োজনীয়তা।

৪. উন্নত ঘাস ও তার চাষ পদ্ধতি

৫. কাঁচা ঘাস সংরক্ষন বা সাইলেজ তৈরী।

# Practical Action- Bangladesh

## FoSHoL Project, Faridpur

## Schedule of the Beef Fattening training course

| Day | Time | Lesson No. | Subject/Topes | Conducting person |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 10:00-11:00 | 1 | Orientation and inauguration of the training course<br>➢ Introduction and inauguration<br>➢ Objective and expectation of the training course | VO/CO |
| | **11:00-11:15** | **Tea Break** | | |
| | 11:15-1:00 | 2 | ➢ Cattl breed & its criteria<br>➢ Importance of milk and its production | VO/CO |
| | **1:00-2:00** | **Lunch Break** | | |
| | 2:00-3:00 | 3 | ➢ Selection of cattle as milking cow<br>Step to be taken for cow rearing includes, housing, feeding, dewarming | VO/CO |
| | 3:00-4:00 | 4 | ➢ Dewaring and concentrate feeding (cont.)<br>➢ UMS preparation –Theory& Practical | VO/CO |
| | 4:00-4:30 | 5 | ➢ Review of day long discussion | VO/CO |
| 2nd | 10.00-11:00 | 6 | ➢ Review of the discussion of previous day | VO/CO |
| | **11:00-11:15** | | **Tea break** | |
| | 11.15-12:00 | **7** | ➢ Diseases and its prevention and treatment | VO/CO/RP |
| | 12:00-1:00 | 8 | ➢ Common diseases and treatment cont. | VO/CO/RP |
| | **1:00-2:00** | | **Lunch** | |
| | 2:00-3:30 | 9 | ➢ Fodder production<br>➢ Silage preparation | VO/CO/RP |
| | 3:30-4:00 | 10 | ➢ Review of the training course | VO/CO |
| | 4:00-4:15 | 11 | ➢ Evaluation of the training course | VO/CO |
| | 4:15-4:30 | 12 | ➢ Closing of the training course | VO/CO |

# গরুর জাত

## ১) দেশী গরু(Local variety)

Θ দেশী জাতের গরুমূলত পরিশ্রমী জাত। বলদ কৃষি কাজ ও ভারবহনের কাজে বেশ উপযোগী।

Θ বাংলাদেশের অধিকাংশ গরুই দেশী জাতের। এরা আকারে ছোট। একটি পূর্ণ বয়স্ক দেশী গরুর ওজন গড়ে ১৫০ কেজি হয়।

Θ দেশী জাতের গাভী দুধ (1-3 লিটার) দেয় কিন্তু দেশী জাতের গরুর মাংশ বেশ সুস্বাদু।

## ২) পাবনা জেলার গরু(Pabna variety)

Θ দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাত। গাভী ও বলদ উভয়েই আকারে বেশ উঁচু ও লম্বা হয়।

Θ দেহের রং গাঢ় ধুসর হতে সাদা ছাপযুক্ত হয়ে থাকে।

Θ একটি গাভী পতিদিন ৬-১০কেজি দুধ দেয়।

Θ এজাতের বলদ দেশীয় সাধারণ জাত হতে অনেক বেশী পরিশ্রমী এবং কৃষি কাজে বেশ উপযুক্ত।

## ৩) ফরিদপুর জেলার গরু(Faridpur variety)

Θ বাংলাদেশের মধ্যে ফরিদপুরের গরুবেশ উন্নত ধরনের। মূলত দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাত।

Θ হরিয়ানা জাতের ক্রস গরুফরিদপুর জেলায় যথেষ্ট দেখা যায়।

Θ এদের রং সাদা, চামড়া পাতলা। এরা মাথা উঁচু করে হাঁটে

Θ ষাঁড়ের ওজন ২৫০-৩০০কেজি এবং গাভীর ওজন ২০০-৩০০কেজি পর্যন্ত হয়।

Θ এসব গাভী দৈনিক প্রায় ১৩-১৪ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয়।

## ৪) ঢাকা মুন্সিগঞ্জ এলাকার গরু(Munshigonj variety)

Θ আকৃতি মধ্যম, একটু লম্বাটে ধরনের বিভিন্ন বর্ণের হয়। মূলত দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাত।

Θ মুখ কিছুটা গরুও লম্বা। গাভীর চূড়া প্রায় থাকে না। পিঠ সোজা, শিং গরুও খুব ধারালো। দুই চোখের মধ্যবর্তী কপালের অংশ বিশেষ উঁচু।

Θ দেহের সাথে আটসাঁট ওলান সম্মুখের দিকে একটু বাঁকানো। মিল্ক ভেইন মোটা ও স্পষ্ট। দৈনিক ১০-১২ লিটার দুধ দেয়।

Θ ষাড় ও বলদ বেশ বড় ও কর্মঠ। গাভী টানা ও চাষের বেশ উপযুক্ত।

## ৫) চট্রগ্রামের লাল গরু(Chittagong red variety)

Θ মূলত দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাত। হালকা লাল বর্ণের এজাতের গরুদেখতে ছোট খাটো পিছনের দিক বেশ ভারী,চামড়া পাতলা, শিং ছোট ও চ্যাপ্টা।

Θ মুখ খাটো ও চওড়া। লেজ যথেষ্ট লম্বা এবং শেষ প্রান্তে চুলের গুচ্ছ লাল বর্ণের।

Θ ওলান বেশ বর্ধিত। বাঁট সুডৌল। মিল্ক ভেইন স্পষ্ট। দৈনিক ১০-১২ লিটার দুধ দেয়।

Θ ষাঁড় ও বলদ বলিষ্ট ও শক্তিশালী। কৃষি ও ভারবহনের কাজে উপযোগী।

## ৬) শাহিওয়াল গরু(Sahiwal variety)

Θ শাহিওয়াল পাকিস্তানের একটি দুধাল জাতের গরু। বর্তমানে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতসহ বিশ্বের মহুদেশে এজাতের গরুপালিত হয়।

Θ ধীর ও শান্ত প্রকৃতির। মোটাসোটা ভারী দেহ। ত্বক পাতলা ও শিথিল।

Θ পা ছোট, ছোট ও পুরু শিং নড়ে। মাথা চওড়া ও পোল উঁচু। কান ঝুলানো ও কানের ভিতর কালো দাগ থাকে।

Θ লেজ বেশ লম্বা, প্রায় মাটি ছুঁয়ে যায়। লেজের আগায় দর্শনীয় এক গোছা কালো লোম থাকে।

Θ সাধারণত এই জাতের গরুর দেহের রং ফ্যাকাশে লাল। তবে কখনও  কখনও গাঢ় লাল বা লালের মাঝে সাদা ও কালো ছাপযুক্ত হয়।

Θ গাভীর ওলান বড়, চওড়া, নরম ও মেদহীন। লম্বা মোটা ও সমান আকৃতির বাঁট। দুগ্ধ শিরা বেশ স্পষ্ট যা দূর থেকেও বোঝা যায়।

Θ এজাতের একটি গাভী গ্রামীণ অবস্থায় পালনে ৩০০ দিন দুগ্ধ দানকালে প্রায় ২১৫০ লিটার এবচং ফার্মে পালনে প্রায় ৪-৫ হাজার লিটার দুধ দেয়।

Θ ষাঁড়ের দৈহিক ওজন প্রায় ৫২২ কেজি এবং গাভীল ওজন প্রায় ৩৪০ কেজি হয়ে থাকে।

## ৭) সিন্ধি (Sindhi)

Θ পাকিস্তানের সিন্ধু এলাকায় এজাতের গরুর আদি বাসস্থান। বর্তমানের বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে এজাতটি পালিত হয়।

Θ সাধারণত গাঢ় লাল ও চকলেট বর্ণের হয়ে থাকে। গাভী অপেক্ষা ষাঁড়ের রং বেশী গাঢ় হয়।

Θ আকৃতি মাঝারি, সুডৌল,বলিষ্ট ও দেহ আটসাঁট। গাভীকে শান্তশিষ্ট ও বুদ্ধিদীপ্ত দেখায়।

Θ ভোঁতা শিং যা পাশে ও পিছনে বাঁকানো থাকে। মাথা ও মুখ মণ্ডল ছোট। চওড়া কপাল। কপালের মাঝের অংশ কিছুটা উঁচু।

Θ ষাঁড়ের চূড়া বেশ উঁচু গল কম্বল বৃহদাকার ও ভাঁজযুক্ত। নাভি চর্ম বড় ও ঝুলন্ত। ষাঁড়ের ওজন প্রায় ৪৫০ কেজি।

Θ গাভীর ওলানের গঠন বেশ সুন্দর ও সামাঞ্জস্যপূর্ণ। ওজন  প্রায় ২৯৫ কেজি। প্রতি বিয়ানে সর্বোচ্চ ৫,৪৪৩ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয়। এজাতের বলদ দিয়ে কৃষি কাজ করা যায়।

## ৮) জার্সি (Jersey)

Θ প্রায় ৫০০ বছর ধরে ইংলিশ চ্যানেলের জার্সি দ্বীপে জার্সি জাতের গরুর প্রজনন হয়ে আসছে পরিকল্পিত প্রজননের ফলে জার্সি প্রসিদ্ধ দুধাল জাত হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

Θ লম্বা দেহ, খাটো পা এবং চূড়া হতে কোমর পর্যন্ত পিঠ একদম সোজা থাকে।

Θ বিভিন্ন রংয়ের হয়। তবে প্রধানত হালকা লালচে বাদামী রং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

Θ চওড়া জোড়া ডিশযুক্ত কপাল। শিং পাতলা ও সামনের দিকে কিছুটা বাঁকানো থাকে।

Θ মুখবন্ধনী বা মাজেল কালো ও চকচকে হয়।

Θ জার্সি জাতের গাভী বাংলাদেশের আবহাওয়ায় পালনে উপযোগী।

Θ এজাতের গাভীর শারিরীক গঠন ছোট হওয়ায় খাদ্যের পরিমাণ কম লাগে কিন্ত দুধ উৎপাদন ঠিকই হয়।

Θ গাভী ভীতু প্রকৃতির কিন্তু ষাঁড় কিছুটা অবাধ্য স্বভাবের । গাভী মাঝারী আকৃতির এবং ওজন প্রায় ৩৯০কেজি হয়ে থাকে।

Θ গাভীর ওলান চমৎকার। ইংল্যাণ্ডের একটি জার্সি গাভী এক বিয়ানে ২৫০০-৫০০০ লিটার দুধ দেয়।

### ৯) হলস্টিন (Halstein)

Θ হলস্টিন গরুর উৎপত্তি হল্যাণ্ড বা নেদারল্যাণ্ড। এজাতের গরুকে পূর্বে হলস্টিন-ফ্রিজিয়ান বলা হত। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে এজাতের গরুদুধাল জাত হিসেবে পালন করা হয়।

Θ হলস্টিন গরুর বর্ণ ছোট বড় কালো সাদা ছাপযু³ । তবে পায়ের নিম্নাংশ(হাটুর নীচে) সাধারণত সাদা হয়।

Θ এজাতের গরুর মাথা লম্বাটে ও সোজা হয়। চওড়া মাজেল ও খোলা নস্ট্রিল থাকে।

Θ অন্যান্য জাতের গরুর ন্যায় এদরে পিঠ চুড়া থাকেনা।

Θ এজাতের গাভী শান্ত স্বভাবের তবে ষাঁড় উগ্র স্বভাবের হয়। গাভীল ওজন প্রায় ৭৫০কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন প্রায় ১০০০কেজি।

Θ একটি হলস্টিন জাতের গাভীর দুধ দিনে তিনবার দোহন করে এক বিয়ানে প্রায় ১৯.৯৯৫ লিটার দুধ পাওয়া যায়।

### ১০)হারিয়ানা (Hariana)

Θ ভারতের হারিয়ানা রাজ্যে এজাতের গরুর আদি বাসস্থান বলে স্থানের নামানুসারে নাম করণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে এজাতের গরুপালিত হয়। এটি একটি দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাতের গরু।

Θ দেহের গঠন বলিষ্ট ও আঁটসাঁট। লম্বা গরু পা বিশিষ্ট এজাতের গরুউচ্চতায় বেশ লম্বা হয়।

Θ মাথা ও মুখ লম্বা ও গরু। গলা লম্বা কপাল চ্যাপ্টা, চোখ বড় বড় ও উজ্জল। শিং ছোট ও গরুযা উপর দিকে উঠানো  থাকে।

Θ মাথার  পোল মধ্যস্থ অস্থি বেশ উন্নত। দেহের তলনায় লেজ ছোট ও গরু।

Θ গাভীর ওলান সামনে পিছনে প্রশস্থ। সামনের বাঁট পিছনের বাঁট অপেক্ষা লম্বা

Θ এজাতের গরুকৃষি কাজ বা ভারবহন ও দুধের জন্য বেশ উপযোগী।

Θ একটি গাভী প্রতি বিয়ানে প্রায় ১৪০০ লিটার দুধ দেয়।

### ১১)সংকর জাত (Cross bred)

Θ দেশী জাতের গাভীর সাথে বিদেশী জাতের ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সংকর জাতের গরুউৎপাদন করা হয়। আমাদের দেশে প্রধানত হলস্টিন,জার্সি, শাহিওয়াল, সিন্ধি জাতের ষাঁড়ের সিমেন কৃত্রিম প্রজননে প্রয়োগ করে সংকর জাতের গরুউৎপাদন করা হয়। সংকর জাতের  গরুর বৈশিষ্ট্য তার জাত দ্বয়ের সংমিশ্রণে হয়ে থাকে। তাই সংকর জাতের গরুদেশী অপেক্ষা আকারে হয় এবং বেশী দুধ দেয়। একটি পূর্ণ বয়স্ক জাতের গাভীর ওজন ২০০-৩০০কেজি হয়ে থাকে। বিদেশী উন্নত জাতের গরুঅনেক সময় আমাদের দেশের আবহাওয়ায় পালনের উপযোগী হয় না। কিন্তু সংকর জাতের পালন আমাদের দেশের জন্য বেশী উপযোগী্ তাই বাংলাদেশে পালনের জন্য সংকর জাতের গরুউৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

## গবাদিপশুর খাদ্য

জীবন ধারনের জন্য খাদ্য অত্যাবশ্যক। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যে সব দ্রব্য গ্রহনের মাধ্যমে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও শক্তি উৎপাদিত হয় তাকে খাদ্য বলে।

খাদ্যের কাজ:

- ❖ দেহের তাপ সংরক্ষণ, শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ও সর্বোপরি জীবন ধারনের জন্য খাদ্য অপরিহার্য।
- ❖ বাড়ন্ত অবস্থায় পশুর সুষ্ঠুভাবে দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্য আবশ্যক।
- ❖ পশুর সময়মত গরম হওয়া, গর্ভধারন, বাচ্চা প্রসব তথা পশুর উর্বরতা রক্ষার জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। এছাড়া গর্ভবতী পশুর গর্ভস্থ বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

- পশুর দুধ উৎপাদনের পরিমানের উপর পশু খাদ্যের উৎপাদন ও পরিমান বৃদ্ধি আবশ্যক। অর্থ্যাৎ গাভীকে খাদ্য সরবরাহের উপর তার দুধের পরিমান ও মান নির্ভর করে।
- পশুর কাজের ধরন ও পরিশ্রমের উপর পশু খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। অর্থ্যাৎ পশু শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমান খাদ্যের দরকার পড়ে।
- পশুর মাংস প্রোটিনযুক্ত। তাই উৎকৃষ্ট মানের মাংসের জন্য উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। সুষম পশু খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্যের সকল উপাদান থাকে।

**খাদ্যের উপাদান:**

**প্রধানত ৬ প্রকার খাদ্য উপাদান আছে যথা-**

১. **পানি**
২. **শর্করা**
৩. **আমিষ**
৪. **চর্বি**
৫. **খনিজ**
৬. **ভিটামিন**

| **ক্র: নং** | **প্যারামিটারস** | **পানি** | **শর্করা** | **আমিষ** | **চর্বি** |
|---|---|---|---|---|---|
| (১) | উৎস | স্বাভাবিক পানি | চিনি, লালীগুড়, গম, চাল, ভূট্টা, ঘাস, খড়। | শুটকী মাছের গুড়া, খৈল, ডাল ইত্যাদি | মাছের তেল, উদ্ভিজ্জ তেল, মাংসের চর্বি |
| (২) | অত্যাবশকীয় কাজ | দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য পরিমাপক | দেহের তাপ ও শক্তির উৎস | শরীরের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ, দেহের প্রতিরোধ শক্তিকে বজায় রাখে | দেহের তাপ ও শক্তি উৎপাদন |
| (৩) | অভাব জনিত উপসর্গ | হজমে ব্যঘাত, দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন হ্রাস | দেহের ওজন হ্রাস, দুধ উৎপাদন হ্রাস ও গাভীর কিটোসিস রোগ | বাড়ন ব্যহত, দূর্বলতা, দৈহিক ওজন হ্রাস, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস ও দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস | পানি পান বৃদ্ধি ও দেহে পানি ধরা, দেহের ওজন হ্রাস ও বাড়ন ব্যহত |

**দুগ্ধবতী গাভীর জন্য সুষম খাদ্য তালিকা :**

***১ম ৫কেজি দুধের জন্য-***

১. কাঁচা (সবুজ) ঘাস.......................................১৪-১৫ কেজি
২. দানাদার খাদ্য মিশ্রন....................................৩ কেজি
৩. আয়োডিন লবন...........................................১০০ গ্রাম
৪. পরিস্কার পানি........................................... যথেষ্ট পরিমান
৫. ইউরিয়া মিস্রিত খড়...................................... ০.৫ কেজি

❖ **দানাদার খাদ্য মিশ্রন:** **( ৩ কেজির জন্য)**

১. গমের ভুষি................................................. ১ কেজি
২. চালের কুঁড়া................................................. ১ কেজি
৩. খেসারি ভাংগা............................................. ৫০০ গ্রাম
৪. তিল/বাদামের খৈল......................................... ৩০০ গ্রাম
৫. ভিটামিন প্রিমিক্স............................................ ১০০ গ্রাম
৬. লবন......................................................... ১০০ গ্রাম

এভাবে মিশ্রিত খাদ্য প্রতিদিন ৩-৪ বারে খাওয়াতে হবে এবং পাশাপাশি ১৪-১৫ কেজি সবুজ কাঁচা ঘাস দিতে হবে।
পরবর্তী অতিরিক্ত ৩ কেজি দুধের জন্য অতিরিক্ত আরও ১ কেজি দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।

**গর্ভবতী অবস্থায় গাভীর যত্ন**

- গাভী বা বকনার গর্ভধারণ কাল ২৭০-২৮০ দিন। এই জন্য-
- প্রজননের ৮০-৯০ দিন পর পশু চিকিৎসক দিয়ে গর্ভধারণ নিশ্চিত করতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের সম্ভাব্য দিন নির্ণয় করতে হবে।
- ৫-৬ মাস গর্ভধারণ কালে খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নতর করতে হবে। এবং দৌড় ঝাপ যেন না করে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- র্গভাবস্থার শেষ তিন মাস বাচুর এবং মায়ের দিকে বেশী নজর দিতে হবে এবং শেষ মাসে গাভীকে সমপুর্ণ বিশ্রামে নিয়ে সুষম খাবার প্রদান করতে হবে।
- এ সময়ে দৈনিক ২-৩ কেজি সুষম খাদ্যের পাশাপাশি সবুজ ঘাস দিতে হবে। গাভীর জন্য প্রতিদিন ১৪-১৫ কেজি সবুজ ঘাস, ৩-৪ কেজি খড়, ২-৩ কেজি দনাদার ও পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করতে হবে।
- গরমকালে দৈনিক একবার ও শীতকালে সপ্তাহে দুই বার গোসল করাতে হবে।
- গর্ভবতী অবস্থায় গাভীকে পালের অন্যান্য গরুথেকে আলাদা করতে হবে, অন্তত এক মাস আগে াবশ্যই তা করতে হবে।
- প্রসবের তিন সপ্তাহ পুর্বে হতে সহজ পাচ্য খাবার দিতে হবে এবং কয়দিনের জন্য দানাদার খাদ্য প্রদান কমিয়ে দিতে হবে।

**বাচ্চা প্রসবের পূবাভাস ও ব্যবস্থনা**

- বাচ্চা প্রসবের পূর্বে গাভীর অঙ্গ- প্রত্যঙ্গে কিছু বাহ্যিক লক্ষণ ফুটে উঠে। যেমন
- গাভীর উলান ফুলে উঠে, বাট দিয়ে ঘন দুধের মত তরল নিঃসৃত হয়।
- যোনি মুখ বড় ও ঝুলে যাবে এবং নরম ও ফোলা ফোলা হয়ে উঠবে।
- লেজের গোড়ার দুই পাশে গর্তের মত আকার স্পষ্ট হয়ে উঠে।
- যোনিমুখ দিয়ে আঠলো তরল বের হবে।
- পানির থলি বের হবে এবং সবশেষে প্রসবের সময় বাছুরের সামনের দুই পা ও নাক দেখা যাবে।

**ব্যবস্থাপনা**

স্বভাবিক প্রসব হলে বাছুরকে সাথে সাথে গাভীর কাছে রাখতে হবে।
গাভীর পেছনের অংশ ও প্রসবের রাস্তার বাইরের অংশ জীনানুনাশক ঔষধ মিশ্রিত পানি দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
স্বভাবিক প্রসব হলে ৩-৪ ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল মাটিতে পড়ে যাবে এবং তা সাথে সাথে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।কোন ক্রমেই এটি শুকাতে বা গাভীকে খেতে দেয়া যাবেনা।

প্রসবের পর মায়ের প্রথম শাল দুধ বাচ্চকে খাওয়াতে হবেএবং বাট চুষতে দিতে হবে।
দানাদার খাদ্য কিছুটা কমিয়ে কাঁচা ঘাস বেশী দিতে হবে।
দুধ দোহনের আগে উলান, তলপেট ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। সাথে গাভীকে সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে।
গাভীর ঘর পরিস্কার রাখতে হবে ও বাছুর দাড়ানোর চেষ্টা করলে তাকে সাহায্য করতে হবে।

**বাছুরের যত্ন ও পরিচর্যা**

আশানুরুপ উৎপাদন পেতে হলে জন্মের পর হতেই একটি বাছুরের যত্নে,পরিচর্যা, খাদ্য ও প্রতিপালন ব্যবস্থা উন্নত হওয়া প্রয়োজন। খামার স্থাপন করে লাভবান হতে শংকর জাতের অথবা দেশী উন্নত জাতের ও অধিক উৎপাদনশীল গাভী পালন করা উচিত। এ ধরনের গাভী হতে প্রাপ্ত বাছুরের অধিক যত্ন প্রয়োজন এবং এ জন্য এদরে পরিচালনা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন
জন্মের পর প্রথমেই গাভীর বাসস্থানের পাশেই শুকনা জায়গায় বাঁশ দিয়ে ঘেরাও করে  শুকনা খড় বিছিয়ে বাছুরের থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কয়েকদিন পর পর ঘর পরিস্কার করে পুরনো খড় ফেলে দিয়ে অথবা রোদে শুকিয়ে নতুন করে দিতে হবে।

**দুধ**

সাধারণত একটি বাছুকে  তার শরীরের ওজনের ১০% দুধ খাওয়াতে হয়। বাছুরকে জন্মের পর ৫-৭ দিনের মধ্যে অবশ্যই শাল দুধ খাওয়াতে হবে। ৬-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক নির্দিষ্ট সময়ে ৩-৪ বার দুধ খাওয়াতে হবে। পরবর্তীতে দৈনিক ২বেলা দুধ খাওয়াতে হবে।

**বাছুরের জন্য আঁশ ও দানাদার খাদ্যঃ**

বাছুরকে  জন্মের ১মাস পরেই কিছু কিছু কাচাঘাশ ও দাদনাদার খাদ্যে অভ্যস্ত করে তুলতে হয়। ২মাস বয়স হতে পরিমিত সহজ পাচ্য আঁশ জাতীয় খাদ্য এবং দৈনিক ২৫০-৫০০গ্রাম দানাদার খাদ্য দিতে হবে। বয়স অনুসারে ক্রমান্বয়ে দানাদার খাদ্যে পরিমাণ বাড়িয়ে ৪মাস বয়সে দৈনিক প্রায় ৭৫০ গ্রাম, ৬-৯মাস বয়স পর্যন্ত ১কেজি এবং ১বৎসর বয়সে দৈনিক প্রায় ১.৫কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হবে। অনুরূপ কাঁচা ঘাসের পরিমাণ বাড়িয়ে ৬-৮কেজি পর্যন্ত দিতে হবে।

**বাছুরের জন্য দানাদার খাদ্য**

| খাদ্যের উপাদান | পরিমাণ | |
|---|---|---|
| | নমুনা-১ | নমুনা-২ |
| গমের ভুষি | ৩.৫ কেজি | ৬.৫ কেজি |
| খেশারী ভাঙ্গা | ১.৫ কেজি | ২.৫ কেজি |
| ছোলা ভাঙ্গা | ১ কেজি | |
| গম বা ভুট্রা ভাঙ্গা | ২.৫ কেজি | |
| তিলের বা সারিষার খৈল | ১ কেজি | ৫০০ গ্রাম |
| খনিজ বা ভিটামিন প্রিমিক্স | ৪০০ গ্রাম | ৪০০গ্রাম |
| আয়োডিন লবণ | ১০০গ্রাম | ১০০গ্রাম |
| সর্ব মোট | ১০ কেজি | ১০কেজি |

গৃহপালিত পশুর বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি হয়ে থাকে। যেমন-

১। সংক্রামক রোগ,
২। পরজীবী ঘটিত রোগ,
৩। অপুষ্টিজনিত রোগ,

৪। পরিপাকতন্ত্রের রোগ,

৫। বিপাকীয় রোগ এবং

**সংক্রামক রোগ**

গৃহিপালিত পশুর মারাত্মক সংক্রামক রোগ সাধারণত দুধরনের রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়। যেমন-

১। ভাইরাস জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত রোগ

২। ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত রোগ

সংক্রামক রোগ ছড়ানোর কারণঃ

পশুর দেহে সংক্রামক রোগের সাধারণত মুখগহ্বর, নাসারন্দ্র চামড়ার ক্ষত,যোনি পথ, মল-মূত্র ত্যাগের রাস্তা, বাঁটের ছিদ্র, চোখ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রবেশ করে। আক্রান্ত পশু হতে সুস্থ পশুতে রোগজীবাণু ছড়ানোর প্রধান মাধ্যমগুলো হলো-

১। বাতাসের মাধ্যমে

২। জীবজন্ত ও কীটপতঙ্গ যেমন- কুকুর,বিড়াল, শৃগাল,বেজী,ইদুর, মশা,মাছি ইত্যাদি বিভিন্ন কীটপতঙ্গের মাধ্যমে

৩। বিভিন্ন পাখি যেমন- চিল,শকুন,কাক ইত্যাদির মাধ্যমে

৪। দুষিত পানির মাধ্যমে রোগজীবাণু সুস্থ পশুতে সংক্রামিত হতে পারে।

৫। হাটবাজার হতে ক্রয়কৃত পশু বা পশুজাতদ্রব্যের মাধ্যমে

৬। পশুর চামড়া ও লোমের মাধ্যমে রোগজীবাণু সংক্রামিত হতে পারে।

৭। খামারের পরিচর্যাকারীর দ্বারাও রোগজীবাণু ছড়াতে পারে।

৮। যানবাহনের মাধ্যমেও রোগজীবাণু সংক্রামিত হতে পারে।

**সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা**

সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশুকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। ভাইরাস জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত পশু অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পুর্বেই মারা যায়। চিকিৎসা করার সময় পাওয়া যায় না। ব্যাকটেরিয়া জীবাণু গঠিত রোগের প্রাথমিক অবস্থায় লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসা করালে ফল পাওয়া যায়।

১। স্বাস্থ্যসম্মত লালন পালন ব্যবস্থা, নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে ঘর ধুয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২। বাজার হতে ক্রয় করা বা অন্য স্থান হতে সংগ্রহ করা পশুকে এনেই খামারের সুস্থ পশুর সাথে রাখা যাবে না। পশুকে দু থেকে তিন সপ্তাহ আলাদা ঘরে রেখে সুস্থ প্রমানিত হলে খামারের অন্যান্য পশুর সাথে রাখা যাবে।

৩। প্রতিষেধক টিকা প্রদান-সুস্থ অবস্থায় পশুকে নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

৪। আক্রান্ত পশুকে বাজারে বিক্রয় করার জন্য বা অন্য কোথায়ও নেওয়া যাবে না। অসুস্থ পশুকে সুস্থ্যগুলো হতে আলাদা করে রাখতে হবে।

৫। বাসস্থানে যাতে বন্য জীবজন্ত পাখি আসতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে, তাছাড়া মশা-মাছি,

ইদুর ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ ধ্বংস করতে হবে।

৬। পশুর খাদ্য সব সময় টাটকা, নির্ভেজাল হতে হবে। স্যাঁতসেঁতে ছাতাপড়া খাদ্য পশুকে কখনও খেতে দেওয়া উচিৎ নয়। পশুকে দৈনিক পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি খেতে দিতে হবে।

৭। বহিরাগত দর্শকদের খামারে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিৎ নয়। খামারে প্রবেশ করতে হলে পা বা জুতার তলা জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে নিতে হবে।

৮। সংক্রামক রোগে মৃত পশুকে যেখানে সেখানে না ফেলে সাথে সাথে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে এবং চুন ছিটিয়ে দিতে হবে।

**গরু মহিষের সংক্রামক রোগ**

১। ভাইরাস জীবাণু দ্বারা সংঘটিত রোগ।
- ক) ক্ষুরারোগ (FMD)
- খ) গো-বসন্ত (Rinderpest)
- গ) জলাতংক- (Rabies)

২। ব্যাকটেরিয় জীবাণু দ্বারা সংঘটিত রোগ।
- (ক) তড়কা (Anthrax)
- (খ) গলাফুলা (Haemorrhagic septicaemia)
- (গ) বাদলা (Black quarter)
- (ঘ) ওলান প্রদাহ (Mastitis)
- (ঙ) বাছুরের নিউমোনিয়া (Calf pneumonia)

এ ছাড়া ও বা ফ্যাংগাস জীবাণু দ্বারাও কিছু রোগ সংঘঠিত হয়ে থাকে।

## ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত রোগ

**ক্ষুরারোগ (Foot & Mouth Disease)**

জোড়া খুর বিশিষ্ট পশু এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সংস্পর্শ, খাদ্যদ্রব্য,লালা ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য এবং বাতাসের মাধ্যমে রোগ জীবাণু সুস্থ পশুতে সংক্রমিত হয়ে থাকে।

লক্ষণ

মুখে,জিহ্বায় ও খুরায় ফোস্কা পড়ে। পরে ফোস্কা ফেটে ঘা হয়। মুখ হতে লালা ঝরে। শরীরের তাপমাত্রা প্রথমে বেড়ে যায়। পরে স্বাভাবিক হতে পারে। অসুস্থ পমু কিছু খেতে পারে না। হাঁটতে পারে না। ফলে কোন কাজই করতে পারে না। পশু দুর্বল হয়ে যায়। গাভীর দুধ কমে যায়। বড় পমু কম মারা যায়। তবে, আক্রান্ত বাছুরকে বাঁচানো যায় না।

রোগ প্রতিকার

অসুস্থ পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা করে মুখের ও পায়ের ঘায়ের চিকিৎসা করতে হয়। পশুকে নরম খাদ্য খাওয়াতে হয়। রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে সমস্ত পশুকে রোগের টিকা দিতে হয়।

প্রতিরোধ

১। নিয়মিত টিকা প্রদান ও

২। পশু চিকিৎসকের পরামর্শমত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহন।

**গো-বসন্ত (Rinderpest)**

এটি একটি ভাইরাস জনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। গরুও মহিষ এ রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শ, খাদ্যদ্রব্য,লালা ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য এবং বাতাসের মাধ্যমে রোগ জীবাণু সুস্থ পশুতে সংক্রমিত হয়ে থাকে।

লক্ষণ

শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। মুখে ও খাদ্যনালিতে ঘা হয়। পায়খানা প্রথমে শক্ত হয়, পরে পাতলা হয়। মুখে দুগন্ধ হয়, শ্বাসকষ্ট হয়। নাক ও চোখ দিয়ে পানি ঝরে। পশুর খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আক্রান্ত হওয়ার পর ২৪ ঘন্টা হতে এক সপ্তাহের মধ্যে পশু মারা যায়।

প্রতিকার

অসুস্থ পশুর চিকিৎসা করে লাভ হয় না। তাই রোগ প্রতিরোধের জন্য -

১। নিয়মিত টিকা প্রদান ও

২। পশু চিকিৎসকের পরামর্শমত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

**জলাতংক (Rabies)**

সাধারণত কুকুর,বিড়াল বা বন্য প্রাণীর কামড়ে এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত প্রাণীর লালা সুস্থ প্রাণীর দেহের ক্ষতে লেগে ও রোগ ছড়াতে পারে।

লক্ষণ

মুখ দিয়ে লালা ঝরে, আস্তে আস্তে পক্ষাঘাত দেখা দেয়। দেহের পিছনের অংশ অবশ হয়ে যায় এবং কিছুই গিলতে পারেনা।

প্রতিকার

লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর চিকিৎসা করে লাভ হয়না। তাই রোগ প্রতিরোধের জন্য- ১। নিয়মিত টিকা প্রদান ও ২। পশু চিকিৎসকের পরামর্শমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

**ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রামিত রোগ**

ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রোগ গবাদিপশুতে সংক্রামিত হয়, এর মধ্যে আমাদের দেশের জন্য মারাত্ম রোগগুলো হলো-

(ক) তড়কা (Anthrax)
(খ) গলাফুলা (Haemorrhagic septicaemia)
(গ) বাদলা (Black quarter)
(ঘ) ওলান প্রদাহ (Mastitis)
(ঙ) বাছুরের নিউমোনিয়া (Calf pneumonia)

**তড়কা (Anthrax)**

রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শ,খাদ্যদ্রব্য,লালা ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য,কীট পতঙ্গ, চামড়া,হাড় এবং নিঃশ্বাসের মাধ্যমে রোগ জীবাণু সুস্থ পশুতে সংক্রমিত হয়ে থাকে।

লক্ষণ
পশু হঠাৎ মাটিতে ঢলে পড়ে। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। খিচুনী দিয়ে পশু মারা যায়। অনেক সময় লক্ষণ দেখা দেওয়ার পুর্বেই পশু মারা যায়। মৃত্যুর সাথে সাথে পেট ফুলে যায়। নাক,মুখ কান ও মলদ্বার দিয়ে আলকাতরার মত রক্তযুক্ত বের হয়।

প্রতিকার
অসুস্থ পশুর চিকিৎসা করে লাভ হয়না। তবে লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে এন্টিবায়োটিক (পেনিসিলিন) ইনজেকশন দিয়ে ফল পেতে দেখা যায়।

রোগ প্রতিরোধের জন্য- ১। নিয়মিত টিকা প্রদান ও ২। পশু চিকিৎসকের পরামর্শমত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়। মৃত পশু পুড়িয়ে বা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়।

**গলাফুলা (Haemorrhagic septicaemia)**
রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শ, খাদ্যদ্রব্য,লালা, মল মূত্র ও ব্যবহার্য দ্রব্যের মাধ্যমে রোগ জীবাণু সুস্থ পশুতে সংক্রমিত হয়ে থাকে।

লক্ষণ
আক্রান্ত পশুর ঘাড়, মাথা ও গলা ফুলে যায়। শরীরের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়। পেটে ব্যাথা হয় এবং উদরাময় দেখা দেয়। শ্বাসকষ্ট হয়। নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে। পশু গলা বাড়িয়ে হা করে জিহ্বা বের করে নিঃশ্বাস নিতে চেষ্ট করে। কিছু খেতে পারে না এবং জাবরকাটা বন্ধ হয়ে যায়। দুধ দেয়া বন্ধ হয়ে যায় ও আক্রান্ত হওয়ার ১-২ দিনের মধ্যে পশু মারা যায়।

প্রতিকার
অসুস্থ পশুর চিকিৎসা করে লাভ হয়না। তবে লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে এন্টিবায়োটিক (পেনিসিলিন) ইনজেকশন দিয়ে ফল পেতে দেখা যায়।

রোগ প্রতিরোধের জন্য- ১। নিয়মিত টিকা প্রদান ও ২। পশু চিকিৎসকের পরামর্শমত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়।

**বাদলা (Black quarter)**
সাধারণত ৬ মাস থেকে ২ বৎসর বয়সে এই রোগ দেখা যায়। রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শ, খাদ্যদ্রব্য,লালা, মল মূত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মাধ্যমে রোগ জীবাণু সুস্থ পশুতে সংক্রমিত হয়ে থাকে।

লক্ষণ
পশু হঠাৎ খোঁড়াতে থাকে। শরীরের পিছনের অংশে মাংসপেশী ফুলে যায়। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ফুলা জায়গায় চামড়া খসখসে হয়। চাপ দিলে পশু ব্যাথা অনুভব করে। হাতে গরম অনুভূত হয় এবং চাপ দিলে ফুলা জায়গায় চড় চড় শব্দ হয়। আস্তে আস্তে ফুলা স্থান কালচে রং এর হয়ে যায়। আক্রান্ত জায়গা কাটলে দুর্গন্ধযুক্ত গাঢ়, লাল বা কালচে রং এর ফেনা বের হয়। ফুলা জায়গায় পচন ধরে কয়েক ঘন্টার মধ্যে পশু মারা যায়।

প্রতিকার
রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়া সাথে সাথে সালফোনেমাইড অথবা এন্টিবায়োটিক (পেনিসিলিন) ইনজেকশন দিয়ে ফল পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ

১/৬ মাস বয়সের পুর্বে টিকা টিকা প্রদান ও ২। পশু চিকিৎসকের পরামর্শমত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়।

**ওলান প্রদাহ (Mastitis)**

অধিক দুধ দেওয়া গাভীতে এ রোগ হতে দেখা যায়। অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, ময়লা হাতে দুধদোহন, বাঁটে বা ওলানে আঘাত বা দুধ জমাট বেঁধে থাকা প্রভৃতি কারণে রোগ সংক্রমিত হয়ে থাকে।

লক্ষণ

ওলান লাল হয়ে যায়। ওলান হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গরম অনুভূত হয়। পশু ব্যাথা অনুভব করে। দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। দুধ ছানার মত ছাকা হয়। দুধের সাথে রক্তও বের হতে পারে। ওলান শক্ত হয়ে যায়। ওলান ও বাঁট নষ্ট হয়ে গাভীর দুধ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে গাভী অকেজো হয়ে যায়।

প্রতিকার

ওলানের সমস্ত দুধ বের করে বাঁটের ছিদ্র পথে ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মত ব্যবস্থা নিতে হয়। রোগ প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ব্যবস্থা মেনে চলতে হয়।

**বাছুরের নিউমোনিয়া (Calf pneumonia)**

সাধারণত অল্প বয়সের বাছুরে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে।

লক্ষণ

বাছুর ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়। বাছুরের শুকনা কাশি হয়, নাক দিয়ে সর্দি ঝরে। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। হৃদপিন্ডের স্পন্দন বেড়ে যায়। রোগের শেষ পর্যায়ে শ্বাস কষ্ট বেড়ে বাছুর মারা যায়।

প্রতিকার

বাছুরের ঠান্ডা না লাগার জন্য খড় দিয়ে বিছানা করে দিতে হয়। লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে এন্টিবায়োটিক (পেনিসিলিন) ইনজেকশন দিয়ে ভাল ফল পেতে দেখা যায়। রোগ প্রতিরোধের জন্য- পশু চিকিৎসকের পরামর্শমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরজীবীজনিত রোগ

এরা সাধারণত কৃমি নামে পরিচিত। আমাদের দেশে প্রায় শতকরা ৮০ভাগ পশু বিভিন্ন প্রকারের কৃমি রোগে ভুগে থাকে। পশুর পরজীবীকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বা অন্তঃপরজীবী-

২। বহিঃদেহের পরজীবী বা বাহ্যপরজীবী

**দেহাভ্যন্তরের পরজীবী (Endo-parasites)**

এরা কৃমি নামে পরিচিত। আমাদের দেশে প্রায় শতকরা ৮০ভাগ গৃহপালিত পশু এসব কৃমিতে ভুগে থাকে। এ জাতীয় পরজীবীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১) গোলাকৃমি, ২) ফিতাকৃমি ও ৩) পাতাকৃমি।

**গোলকৃমি (Round worm)**

গৃহপালিত পশুকে বহুধরনের গোলকৃমি আক্রমণ করে থাকে। যেমন- পাকস্থলীর কৃমি, অন্ত্রনালির কৃমি, সুতাকৃমি, পিত্তকৃমি, ফুসফুসের কৃমি।

গোলকৃমি পশুর পাকস্থলী,অন্ত্রনালি,শ্বাসযন্ত্র ও অন্যান্য অংশে বাস করে এবং সেসব স্থানে ডিম পারে। পশুর পায়খানার সাথে সেসব ডিম মাটিতে পড়ে। স্যাঁতসেঁতে বা অনুকুল পরিবেশে এ সব ডিম ফুটে লার্ভা বা শূক হয়। এসব শুক মাটি, ঘাস, পাতলা লেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পরজীবীতে রূপান্তরিত হয়। এসব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শূক পশু ঘাস

পাতার সাথে খেয়ে ফেলে, ফলে এগুলো পশুর দেহের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে পাকস্থলী ও অন্ত্রনালিতে গিয়ে বয়স্ক পরজীবীতে পরিণত হয়ে ডিম পাড়ে এবং এভাবে বংশবিস্তার করে।

কৃমি যে পশুর পেটের মধ্যে বাস করে সে পশুর হজমকৃত খাদ্য খেয়ে ফেলে। ফলে পশুর পুষ্টিহীনতা হয়। পশুর ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। শরীরের ওজন কমতে থাকে। গায়ের লোম রুক্ষ দেখায়। পাতলা পায়খানা হয়। পরজীবী পশুর রক্ত চুষে খায় ফলে রক্তশূণ্যতা দেখা দেয়। বাছুরের অন্ত্রনালির বড় গোলকৃমি এক জায়গায় জড়ো হয়ে অন্ত্রনালির পথ বন্ধ করে দেয় ফলে পশু মারা যায়।

কৃমির আক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ খাওয়াতে হবে। বাছুরের বয়স ৩ মাস হলেই পশুকে নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে শুরু করতে হবে। গোয়াল ঘরের গোবর ও আবর্জনা নিয়মিত পরিস্কার করে দুরে গর্ত করে রাখতে হবে। গোয়াল ঘর শুকনা রাখতে হবে। স্যাঁতসেঁতে কাদাপানিযুক্ত মাঠে চরতে দেওয়া যাবে না।

### ফিতাকৃমি (Tape warm)

এ কৃমি সব ধরনের গৃহপালিত পশুতেই  দেখা যায়। এরা সাধারণত পশুর অন্ত্রনালিতে বাস করে। ফিতাকৃমি দেখতে ফিতার মত বেশ লম্বা। অনেক কৃমি লম্বায় ১৫মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফিতাকৃমির রোগজনিত লক্ষণ অনেকটা গোলকৃমির রোগজনিত লক্ষণের মত। অধিক কৃমি বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে পশুর মৃত্যুর কারণ হয়। তবে বাছুরে অধিক কৃমি থাকতে পারে। এতে হজমে বিঘ্ন ঘটে। পশুর পেট ফুলা, উদরাময়, সাধারণ দুর্বলতা ও অবস্থার অবনতি হয়ে থাকে। ফিতাকৃমির চিকিৎসার জন্য বাজারে বহু ধরনের ঔষধ পাওয়া যায়। ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ খাওয়ালে কৃমি ধ্বংস করা যাবে।

### পাতাকৃমি(Fluke)

এ ধরনের কৃমি দেখতে পাতার মতো চ্যাপ্টা হয়। গৃহপালিত পশুতে ৩ ধরনের পাতাকৃমি হয়ে থাকে। যেমন- ১। যকৃতের পাতাকৃমি বা লিভার ফ্লুক, ২। পাকস্থলীর পাতাকৃমি ও ৩। রক্তের পাতাকৃমি।

এসব পাতাকৃমির জীবনচক্র মধ্যপোষক শামুকে সম্পন্ন হয়। যকৃত বয়স্ক পাতা কৃমি পিত্তনালিতে থাকে। সেখানে কৃমি অসংখ্য ডিম মলের সাথে পাড়ে। ডিম স্যাঁতসেঁতে জায়গায় অথবা কাঁদাপানিতে পড়ে কিছুদিনের মধ্যে লার্ভা বা শূক হয়। শূক শামুকে প্রবেশ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার পর বয়স্ক শূক বের হয়ে জলাভূমিতে ঘাস লতাপাতায় লেগে থাকে। ঘাস লতাপাতার সাথে পশু এগুলো খেয়ে ফেলে। তখন ছোট পাতাকৃমি হয়ে পশুর অন্ত্রনালিতে প্রবেশ করে। যকৃতের পাতাকৃমি অন্ত্রনালি হতে পশুর বিভিন্ন অঙ্গ ছেদ করে যকৃত যায়। কিছুদিন যকৃতে থাকার পর পিত্তনালিতে প্রবেশ করে। পিত্তনালিতে পূর্ণ বয়স্ক কৃমি অসংখ্য ডিম পাড়ে।

পাকস্থলী পাতাকৃমি পাকস্থলী থেকে সেখানে ডিম পাড়ে। ডিম পায়খানার সাথে মাটিতে পড়ে লার্ভা হয়। লার্ভা শামুকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে আবার শামুক থেকে বের হয়ে ঘাস, লতা-পাতার সাথে পশুর পাকস্থলী হতে ক্ষুদ্রন্ত্রে যায়। সেখান থেকে বয়স্ক কৃমি হয়ে আবার পাকস্থলীতে এসে অবস্থান করে এবং সেখানে ডিম পাড়ে।

রক্তের পাতাকৃমি গরুর নাকের শিরায় বাস করে সেখানে ডিম পাড়ে, ডিম পরিপাকতন্ত্রে যেয়ে পায়খানার সাথে বের হয়। অন্যান্য পাতাকৃমির মতোই শামুকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পশুর অন্ত্রনালিতে যায়। সেখানে থেকে বিভিন্ন অঙ্গ ভেদ করে নাকের শিরায় প্রবেশ করে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে সেখানে থাকে ও ডিম পাড়ে। পাতাকৃমির আক্রমণে অনেক ধরনের লক্ষণ দেখা যায়। যকৃত পাতাকৃমির আক্রমণে যকৃত ও পিত্তনালি এবং বিভিন্ন অঙ্গে প্রদাহ হয়। পশুর হজমে বিঘ্ন ঘটে। দুর্গন্ধযুক্ত তরল মলত্যাগ করে। পশু দুর্বল হয়ে কর্মশক্তি ও উৎপাদনশক্তি হারিয়ে ফেলে। অধিক কৃমির আক্রমণে বাছুর তাড়াতাড়ি মারা যায়। পাকস্থলীর পাতাকৃমির আক্রমণে হজমের ব্যাঘাত ঘটে, দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত মিশ্রিত তরল পায়খানা হয়। পশুর রক্তশূণ্যতা দেখা দেয় ফলে পশু দুর্বল হয়ে উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আক্রান্ত পশুর তুতনীর নীচে ফূলা দেখা যায়। রক্তে পাতাকৃমির আক্রমণে নাকের রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নাক হতে রক্ত ঝরে। নাসারন্ধ্রে গোটা উঠে নাকের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। পশুর শ্বাসকষ্ট হয় এবং নাক দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হয়। পশুর রক্তশূণ্যতা দেখা দেয়। পশুর খাওয়া কমে যায়। ফলে পশু দুর্বল হয়ে

কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে পশু মারা যায়। কৃমিরোগ প্রতিরোধের জন্য পশু চিকিৎসকের পরমর্শমত নিয়মিত ওষুধ খাওয়াতে হয়। গোয়াল ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং শুকনা রাখতে হবে। স্যাঁতস্যাঁতে কাদা পানিযুক্ত মাঠে পশু চরতে দেওয়া যাবেনা। তাছাড়াশামুক ধ্বংস করার জন্য তুঁতে ব্যবহার করা যায়।

**বহিঃপরজীবী (Ecto-parasites)**

বহিঃদেহের পরজীবী পশুর ত্বকে বাস করে পশুর যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। এ জাতীয় পরজীবীর আক্রমণে পশুর চামড়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের গৃহপালিত পশুতে বহু ধরনের বহিঃ পরজীবীর আক্রমণ হয়ে থাকে, যেমন:

১। আঁটালি, ২। উকুন, ৩। মাছি

বহিঃদেহের পরজীবীর মধ্যে আঁটালি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এ পোকা গৃহপাতিল পশুতে অত্যধিকদেখা যায় এবং ক্ষতি বেশি করে। এরা পশুর ত্বকে বাস করে রক্ত চুষে খায়। এসব আঁটালি বহু রোগজীবাণু বিশেষ করে প্রটোজোয়ার জীবাণু সুস্থ পশুতে সংক্রামিত করে রোগের সৃষ্টি করে।

উকুন:

আমাদের দেশের গৃহপালিত পশুতে উকুনের আক্রমণ বেশ দেখা যায়। উকুনের আক্রমণে পশুর শরীর খুব চুলকায়। ফলে পশু জিনিসের সাথে শরীর ঘসে ক্ষতের সৃষ্টি করে। চোষা উকুন পশুর ত্বকের রক্ত চুষে খায়। ফলে পশ রক্তশূণ্যতায় ভোগে।

মাছি:

বিভিন্ন ধরনের মাছি গৃহপালিত পশুকে আক্রমণ করে থাকে, যেমন-আস্তাবলের মাছি, মহিষের মাছি, ঘোড়ার মাছি, উড়ন্ত মাছি ইত্যাদি। মাছির পশুর শরীরে বসে তাদের অস্থির করে তোলে। অনেক মাছি পশুর ত্বকে বসে রক্ত চুষে খায়। মাছি সাধারণত পশুর দেহের ক্ষতে বসে সেখানে ডিম পাড়ে ফলে ক্ষতে পচন ধরে। ক্ষত শুকায় না। মাছি ক্ষতে বসলে সেসব স্থান চুলকায়। পশু সেসব স্থান শক্ত কিছুর সাথে ঘসে বা জিহ্বা দিয়ে চেটে ঘা আরও বাড়িয়ে দেয়। মাছির উপদ্রব পশুর খাওয়া এবং দুধ প্রদানে ব্যাঘাত ঘটে।

অপুষ্টিজনিত রোগ:

গৃহপালিত পশুর দেহ গঠন, কার্যক্ষমতা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। পশুর খাদ্যে যে কোন উপাদানের অভাবে হলে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। পশু দূর্বল, হয়ে যায়, দুধ উৎপাদন কমে যায়, মাংস উৎপাদন কমে যায়। এরা পশুর কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়।

## ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ

গৃহপালিত পশুর খাদ্যে যেসব ভিটামিনের প্রয়োজন হয় সেগুলো হল ভিটামিন এ,ডি,ই,কে ও বি১২। ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে।

ভিটামিন বি-কমপেক্স এবং ভিটামিন সি:

রোমন্থনকারী পশুর খাদ্যনালিতে অনুজীবের সংশ্লেষে তৈরী হয়। তাই গবাদিপশুতে এসব ভিটামিনের অভাবজনিত লক্ষণ সাধারণত দেখা যায় না।

ভিটামিন এ:

সবুজ কাঁচা ঘাস,সবুজ লতা-পাত এবং হলুদ রং এর শাকসবজিতে প্রচুর কেরোটিন থাকে যা পশুর দেহে ভিটামিন এ তে রূপান্তরিতহয়। যে সব পশু মাঠে চরে প্রচুর কাঁচা লতা-পাতা খায় এরা প্রচুর ভিটামিন এ পায়। যে সব পশুকে ঘরে বেঁধে শুধু খড় বিচালি এবং দানাদার খাদ্য খাওয়ানো হয় সে সব পশুতে ভিটামিন এ এর অভাব দেখা

দেয়। পশুর যকৃত এবং সামুদ্রিক মাছের যকৃতে প্রচুর ভিটামিনএ জমা থাকে। যকৃতের যে কোন রোগে ভিটামিন এ এর অভাব দেখা দেয়।

পশুর দেহে ভিটামিন এ এর অভাব হলে পশু রাত্রিতে দেখতে পায় না বা অল্প আলোতেও দেখতে পায় না। একে রাতকানা রোগ বলা হয়। পশুর দেহে অধিক পরিমাণে ভিটামিন এ এর অভাব হলে পশুর হাঁটাচলায় অসুবিধা হয়। অনেক ক্ষেত্রে মাংসপেশির খিঁচুনিও দেখা যায়। ভিটামিন এ এর অভাবে পশুর ত্বক খসখসে ও লোম রুক্ষ হয়। আক্রান্ত পশুর চোখ ফুলে যায় চোখে সাদা পিঁচুটি জমা হয়। সময়মত চিকিৎসা না করালে পশ অন্ধ হয়ে যায়। ভিটামিন এ এর অভাব দূর করতে হলে পশুকে প্রচুর সবুজ কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে। পশুর দানাদার খাদ্যে কৃত্রিম ভিটামিন এ সমৃদ্ধ মিশ্রণ মিশিয়ে নিয়মিত পশুকে খাওয়াতে হবে। বাছুরকে জন্মের সাথে সাথে গাভীর প্রথম দুধ বা শাল দুধ খাওয়াতে হবে।

ভিটামিন ডিঃ

সাধারণত পশুর জন্য দুধরনের ভিটামিন ডি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন-ডি ২ (আরগোক্যালসিফেরোল) এবং ডি ৩ (কোলিক্যালসিফেরোল)। দেহে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের অভাব হলে বা এই দুইটি পদার্থের অসমতা হলে ভিটামিন ডি এর অভাব হয়। পশুর ত্বকে সূর্যরাশ্মি পড়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভিটামিন ডি তৈরী হয় যা চামড়ার মাধমে পশুর দেহে শোষিত হয়। যেসব পশু মাঠে ঘাটে চরে বেড়ায় এবং প্রচুর সূর্যরশ্মি পায় তাদের দেহে সাধারণত ভিটামিন ডি এর অভাব হয় না। তবে ঘরে বেঁধে পালা পশুতে ভিটামিন ডি এর অভাব দেখা দেয়। সামুদ্রিক মাছ যেমন-শার্ক,কড, হ্যালিবাট জাতীয় মাছের যকৃতে প্রচুর ভিটামিন ডি থাকে।

ভিটামিন ডি এর অভাবে বাছুরের হাড় এবং দাঁতের স্বাভাবিক গঠন হয় না। হাড়ে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণ ঠিকমতো হয় না ফলে বাছুরের হাড় নরম এবং বাঁকা হয়। এ অবস্থাকে রিকেট বলা হয়। বয়স্ক পশুতে ভিটামিন ডি এর অভাব হলে হাড় নরম ও ভঙ্গুর হয় যাকে অসটিওমেলেসিয়া বা ভঙ্গুর অস্থি বলা হয়। পশুর ক্ষুধাহীনতা দেকা দেয়। ফলে পশু না খেয়ে দুর্বল হয়ে যায়। কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। দুধ উৎপাদন কমে যায়। পশুর প্রজননক্ষমতা কমে যায়। পশুর ত্বকে নিয়মিত সূর্যরশ্মি লাগলে ভিটামিন ডি এর অভা হয় না। পশুর দানাদার খাদ্যের সাথে নিয়মিত কৃত্রিম ভিটামিন ডি যুক্ত মিশ্রণ মিশিয়ে খাওয়ালে পশুর ভিটামিন ডি এর অভাব হয় না।

ভিটামিন ইঃ

সাধারণত টাটকা সবুজ ঘাস, লতা-পাতা এবং অংকরোদগমিত শস্যদানা, অঙ্কুরজাত তেলে প্রচুর ভিটামিন ই পাওয়া যায়। ভিটামিন ই এর অভাবে বাছুরের মাংসপেশির বৈকল্যতা দেখা দেয়। হৃৎপিন্ডের মাংসপেশি আক্রান্ত হয়ে পশু হঠাৎ মারা যায়। অস্থির মাংসপেশির সংকোচন, অস্বাভাবিক চলাফেরা এবং পেশি গঠনে অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়। ভিটামিন ই এর অভাবে পশুর প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়। এমনকি পশুর বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে। পশুকে নিয়মিত সুবজ কাঁচা ঘাস, লতা-পাতা, অঙ্কুরোদগমিত শস্যদানা খাওয়ালে এই ভিটামিনের অভাব হবে না। গাভীর দানাদার খাদ্যে কৃত্রিম ভিটামিন ই মিশ্রণ মিশিয়ে খাওয়ালে গাভী এবং গাভীর দুধের মাধ্যমে বাছুর প্রচুর ভিটামিন ই পাবে।

ভিটামিন কেঃ

এটি পশুর দেহে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে বিধায় এই ভিটামিনকে জমাট বাঁধার উপাদান বা ইংরেজিতে Coagulation factor বলে। সবুজ কাঁচা ঘাসে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। গবাদিপশুর পরিপাকতন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া জীবাণু সংশেষের ফলে পশুর প্রয়োজনীয় প্রচুর ভিটামিন উৎপাদিত হয়। এই জন্য গবাদিপশুতে ভিটামিন কে এর অভাবজনিত লক্ষণ খুব একটা দেখা যায় না। তবে এই ভিটামিনের অভাবে হলে পশুর রক্তক্ষরণ বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে। এইরূপ অবস্থায় পশুকে ভিটামিন কে দ্বারা চিকিৎসা করাতে হয়। পশুকে প্রচুর সবুজ কাঁচা ঘাস খাওয়ালে ভিটামিন কে এর অভাব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ভিটামিন বি$_{১২}$ এর অভাবঃ

এই ভিটামিন পশুর আমিষ উপাদান বা Animal Protein Factor (APE) নামে প্রথম আবিস্কৃত হয়। পরে এর নাম ভিটামিন বি$_{১২}$ দেওয়া হয়। এই ভিটামিনের অভাবজনিত লক্ষণ বয়স্ক পশুতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। তবে অল্প বয়স্ক পশুর শরীর ভিটামিনের অভাবে বাড়ে না। পশুর রক্তশূণ্যতা দেখা যায়। শরীরিক বৃদ্ধি দারুণভাবে কমে যায়। ভিটামিন বি$_{১২}$ শুটকি মাছ,মাংস,দুগ্ধ ওদুগ্ধজাত খাদ্য, পশুর কলিজা, মুরগির লিভারে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। মুরগির লিভারে ক্ষুদ্র অণুজীব দ্বারা এই ভিটামিন তৈরী হয়। পশুর খাদ্যে এসব যোগ করলে পশুতে এই ভিটামিনের অভাব হয় না। পশুর দানাদার খাদ্যের সাথে নিয়মিত কৃত্রিম ভিটামিন মিশ্রণ মিশিয়ে খাওয়ালে ভিটামিন বি$_{১২}$ এর অভাব হয় না।

খনিজ পদার্থের অভাবজনিত রোগঃ

ফসফরাসের অভাব সাধারণত দুগ্ধবতী গাভীতে বেশি হয়ে থাকে। অধিক দুগ্ধবতী গাভীর শরীরে যে পরিমাণ ফসফরাস পরিশোধিত হয় তার চেয়ে বেশি দুধের সাথে নিঃসৃত হয়ে যায়। ফলে পশুতে ফসফরাসের অভাবে দেখা দেয়। ফসফরাসের অভাবের প্রথম লক্ষণ পশুর দেহ না বাড়া, দুধ কমে যাওয়া, অনুর্বরতার ফলে গর্ভধারণ রা করা, অস্বাভাবিক ক্ষুধার ফলে হাড় শক্ত বস্তু কামড়ানো বা চিবানো ফসফরাসের অভাবে বাছুর দুর্বল হয়ে জন্ম নেয়। বাছুর বাড়ে না, হাড় বাঁকিয়ে রিকেটস রোগ হয়। বড় পশুতে অস্থিকোমলতা অর্থাৎ অসটিওমেলেসিয়া রোগ হয়।

ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ সব ধরনের পশুতে দেখা যায়। ক্যালসিয়ামের অভাবে পশুর হাড় বাড়ে না। বাছুরের রিকেটস এবং বয়স্ক পশুতে অষ্টিওম্যালেসিয়া রোগ হয়। গাভীর দুধ কমে যায়। অনুর্বরতা দেখা দেয়। তীব্র ক্যালসিয়ামের অভাবে গাভীর দুধ-জ্বর রোগ হয়। সোডিয়াম,পটাশিয়াম,ম্যাগনেশিয়াম,ক্লোরিন এবং সূক্ষ্ম মৌল পদার্থের অভাবে পশুর সাধারণ দুর্বলতা,অনুর্বরতা,দুধ কমে যাওয়া,রুক্ষ ত্বক, রক্তশূণ্যতা,হাড়ের কোমলতা, দৈহিক অবস্থার অবনতি, কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। সাধারণত গবাদিপশুকে সুষম খাদ্য বিশেষ করে প্রয়োজনমতো সবু কাঁচা ঘাস খাওয়ালে খনিজ পদার্থের অভাব হয় না। তাছাড়া পশুর দানাদার খাদ্যে হাড়ের গুড়া ও খনিজ মিশ্রণ মিশিয়ে খাওয়ালে পশুর দেহে খনিজ পদার্থের অভাব হয় না।

## পরিপাকতন্ত্রের রোগ

### পেঁট ফাঁপা (Bloat)

গবাদিপশুর একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগ প্রধানত গরু,মহিষের হজমের ব্যাঘাত জনিত রোগ। জাবরকাটা প্রাণীর পাকস্থলীর প্রথম দুই অংশ যেমন- রুমেন ও রেটিকুলামে পচা গ্যাসযুক্ত ফেনা জমা হয়ে পেট ফেচে যায়। এই অবস্থায় পাকস্থলীর কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় পেটের গ্যাস বের হতে পারে না। ফলে গ্যাস জমে পেট ফেঁপে যায়। ইংরেজিতে এই অবস্থাকে টিমপানাইটিস বা ব্লোট বলা হয়।

পেটফাঁপার কারণ অনিয়মিত খাদ্য, পঁচা বা চাতা পড়া খাদ্য। অভূক্ত থাকার পর হঠাৎ বেশি করে কাঁচা ঘাস খাওয়ার ফলে পেটে গ্যাস জমা হয়ে পশুর পেট ফুলে উঠে। বর্ষাকালে মাঠে-ঘাটে নদী নালায় পানি জমে বহু স্থানেরই ঘাস লতা-পাতা পঁচে যায়। পশু কাঁচা ঘাস বা খাদ্যের অভাবে এইসব পঁচা গাছ-গাছড়া বা পঁচা পানি খেয়ে পেট ফাঁপা রোগে আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণঃ

আক্রান্ত পশুর পেট বাম দিকে ফুলে যায়। পশু খাওয়া ও জাবরকাটা বন্ধ করে দেয়। মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়। জিহ্বা বের হয়ে আছে। পশুর ফুসফুসে চাপ পড়ে। মুখ নিশ্বাস নেয়। পমু খুব অসুবিধা অনুভব করতে থাকে। ব্যথায় একবার মাটিতে শুয়ে পড়ে আবার উঠে দাঁড়ায় এবং লাথি মারতে থাকে। পশুর চোখ লাল দেখায়। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না করালে বা তাড়াতাড়ি গ্যাস বের করে না দিলে অল্প সময়ের মধ্যে পশু মারা যায়।

চিকিৎসা বা প্রতিকারঃ
পাকস্থলী হতে গ্যাস বের করে দেওয়াই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য। পশুর পেটে একটি লম্বা রাবারের নল (Stomach tube) ঢুকিয়ে দিলে গ্যাস বের হয়ে আসে। তবে এতে পুরো বের করা কষ্টকর। তাই, এই নল দিয়ে ৩০ সি.সি. তারপিন তেল, ৩০ সি.সি. স্পিরিট এমন এরোমেট এবং ৫০ সি.সি.তিসির তেল পাকস্থলীতে ঢুকিয়ে দিলে গ্যাস বের হয়ে যায়। একবার চিকিৎসায় উপকার না হলে ছয় ঘন্টা পর একই মাত্রায় আবার খাওয়াতে হবে। এ অবস্থায় শুধু এক কেজি তিসির তেল খাইয়ে দিলে খাইয়ে দিলেও উপকার হয়। এ চিকিৎসায় যদি ফল না হয় তা হলে ডাক্তারের সাহায্যে ট্রোকার কেনুলার দিয়ে পেট ফুটা করে ট্রোকার বের করে ফেললে কনেুলারের মধ্যে দিয়ে গ্যাস বের করতে হবে। পেট ফাঁপার চিকিৎসা খুব সহজ নয়। তাই রোগ হওয়ার সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই উত্তম।

পশুকে পঁচা-বাসি খাদ্য বা মাঠ-ঘাটের পঁচা বা গাছগাছড়া খেতে দেওয়া যাবে না। অভূক্ত অবস্থায় অধিক কাঁচা ঘাস খাওয়ানো যাবে না। নিয়মিত প্রচুর পরিস্কার পানি খাওয়াতে হবে।

## উদরাময়(Diarrhoea)

মানুষের যেমন উদরাময় হয়ে থাকে গবাদি পশুতেও সেইরূপ উদরাময় বা ডাইরিয়া হয়ে থাকে। উদরাময়কে পূর্ণাঙ্গ রোগ বলা যায় না। এটি বিভিন্ন ধরনের রোগের লক্ষণ

বিভিন্ন কারণে,যেমন- ভাইরাস,ব্যাকটেরিয়া,ছত্রাক,প্রোটোজোয়া জাতীয় বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর আক্রমণে,বিভিন্ন ধরনের কৃমির আক্রমণে গবাদি পশুর উদরাময় হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দ্বারা বিশেষ করে মাঠে পঁচা দুষিত খড়,লতা-পাতা,পঁচা পানি খাওয়ার ফলে উদরাময় হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্ষার পানি নামার পর মাঠ-ঘাট,নদী-নালা,ডোবায় খড়, লতা-পাতা পড়ে পানি পঁচে দুষিত হয়ে থাকে। পঁচা দুষিত খাদ্য এবং পানি খেয়ে পশুর উদরাময় হতে পারে। এ সময়ে মাঠে-ঘাটে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ বিরাজ করার ফলে পশুতে বিভিন্ন ধরনরে রোগজীবাণু আক্রমণ বেড়ে যায়, কৃমির উপদ্রব বেড়ে যায়। তাছাড়া বর্ষা বা বন্যার পর মাঠ-ঘাটের পানি নেমে গেলে প্রচুর কঁচি ঘাস জন্মায়। পশু এই কঁচি ঘাস, কচুরিপানা বেশি খেয়ে ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়। উদরাময় বলতে বুঝায় পশুর ঘন ঘন পাতলা মলত্যাগ। শরীর থেকে প্রয়োজনীয় পানি, লবণ,খনিজ পদার্থ বের হয়ে যায়। রোগাক্রান্ত পশু দুর্বল হয়ে পড়ে। খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে বিষক্রিয়া হয়। পশুর মুখ দিয়ে লালা ঝরে, শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। পশু দুর্বল হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। পাতলা পায়খানা বাছুরের বেশি ক্ষতি হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাছুরকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। গবাদিপশুর উদরাময়ের চিকিৎসা অর্থাৎ পাতলা পায়খানা দমন করতে হলে উদরাময়ের কারণগুলো প্রতিরোধ করতে হবে। পশুকে স্যাঁতসেঁতে কাঁদাপানিতে বা নোংরা স্থানে না রেখে শুকনা পরিস্কার জায়গায় রাখতে হবে। বাছুরকে জন্মের পরই প্রথম দুধ বা শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এই দুধে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রতিরোধক ব্যবস্থা থাকে। পশুকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে। ডায়েরিয়া হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরমার্শ মোতাবেক পশুর চিকিৎসা করাতে হবে। কৃমি প্রোটোজোয়ার আক্রমণে পাতলা পায়খানা হলে এদেরকে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। অল্প বয়স হতেই পশুকে নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। পশু যাতে মাঠ-ঘাটের পঁচা ঘাস, লতা-পাতা না খেতে পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। পশুকে প্রচুর পরিস্কার পানি খাওয়াতে হবে যেন মাঠে-ঘাটের পঁচা পানি না খায়।

অতিরিক্ত পাতলা পায়খানা পশুর শরীরের জলীয় অংশ বের হয়ে যায়, তাই পশুকে খাদ্য এবং পানির সাথে নিয়মিত ঝোলাগুড় এবং লবণ মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। প্রয়োজনে ডেক্সট্রোজ সেলাইন ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

# বিপাকীয় রোগ

দুধ জ্বর বা মিল্ক ফিডারঃ

দুধ জ্বরকে ইংরেজিতে মিল্ক ফিডার বলে। প্রসবের সময় বা প্রসবের পর অনেক গাভী পক্ষাঘাতের মত অজ্ঞান হয়ে যায়। এই অবস্থাকে দুধ জ্বর বলা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে উন্নত জাতের অধিক দুগ্ধ উৎপাদনশীল গাভী পালনের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এসব অধিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভীকে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

শরীরে খনিজ পদার্থের বিপাকরে অসুবিধা হলে এবং শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব হলে এ রোগ হয়। রক্তে ক্যালসিয়ামের ভাগ কমে গেলেও দুধ জ্বর হয়ে থাকে। প্রসবের পর মায়ের দুধে অধিক ক্যালসিয়াম থাকে, ফলে তখন দুধের সাথে ক্যালসিয়াম বের হয়ে রক্তে ক্যালসিয়ামের অভাব হয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি করে। আবার স্নায়ুর কর্মক্ষমতার জন্য ক্যালসিয়াম প্রয়োজন তাই  প্রসবের পর ক্যালসিয়াম স্নায়বিক অক্ষমতা হয়ে পক্ষাঘাত দেখা দেয়। দুধ জ্বরে অনেক সময় রক্তে ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস এবং শর্করারও কমে যায়।

দুধ জ্বর হলে প্রথমে গাভীকে অস্থির দেখাবে। আস্তে আস্তে মাথা ও পায়ে কাঁপুনি দেখা যাবে। পিছনের পায়ে দুর্বলতা অনুভব করে পশু শুয়ে পড়বে। পশু খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবে এবং পাকস্থলীর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যাবে। গাভীর ঘাড় বাঁকা হয়ে মাথা ঘাড়ের উপর এসে পড়বে এবং শক্ত হয়ে যাবে। পশ ঘাড় ও মাথা নাড়াতে পারবে না। আক্রান্ত পশুর মুখ হতে লালা ঝরবে। চোখ অর্ধবোজা অবস্থায় থাকবে। শরীরের তাপমাত্রা অনেক কমে যাবে। আস্তে আস্তে গাভীর হিমাঙ্ক বা অচৈতন্য অবস্থা দেখা দিবে। সময়মতো চিকিৎসা না করালে ১২-২৪ ঘন্টার মধ্যে পশু মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দুধ জ্বরের লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক পশুর চিকিৎসা করাতে হবে। দুধ জ্বরের প্রধান চিকিৎসা পশুকে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস জাতীয় ইনজেকশন দ্বারা চিকিৎসা করা। গাভী শুয়ে পড়লে পিঠের নিচে এবং পাশ্বে খড় দিয়ে ঠেস দিয়ে দিতে হবে যাতে শরীর একটু সোজা হয়ে থাকে। রোগ যাতে না হতে পারে সেজন্য প্রসবের কয়েকদিন পূর্বে হতে পশুকে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে। খাদ্যের সাথে নিয়মিত খনিজ মিশ্রণ মিশিয়ে খাওয়ালে ক্যালসিয়ামের অভাব হয় না। প্রসবের পূর্বে প্রতি গাভীকে দৈনিক ৩০ গ্রাম ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটদানাদার খাদ্য বা পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

## কিটোসিস বা কিটোনাধিক্য

এ রোগকে এসিটোনেমিয়া বা এসিডোসিস বলঅ হয়। এ রোগের ফলে খাদ্যে শর্করা ও চর্বির বিপাক ত্রুটিপূর্ণ হয়। রক্তে যথেষ্ট শর্কার না থাকলে চর্বির কিছু অংশ যাকে কিটোন বডি বলা হয় তা ঠিকমতো হয় না। ফলে পশুতে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং পশুর প্রস্রাব ও দুধে এসব পদার্থ পাওয়া যায়। দুগ্ধবর্তী গাভীর শরীরে উপযুক্ত পরিমাণ শর্করা না থাকলে পশুকে শরীরের চর্বির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। অত্যধিক চর্বি ব্যবহারের ফলে রক্তে বিষাক্ত কিটোন বডিস তৈরী হয়।

কিটোসিসের প্রধান লক্ষণ পশুর খাদ্যে অনীহা, দুর্বলাত,দুধ প্রদান কমে যাওয়া এবং রোমন্থন বন্ধ হয়ে যাওয়া। পশুর কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময় হয়ে থাকে। আক্রান্ত পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসে, এমনকি মুখ, প্রস্রাব, দুধ ও ঘরের সমস্ত আবহাওয়ায় এসিটোনের অস্বাভাবিক মসলাযুক্ত গন্ধ বের হয়। পশুর মাংসপেশির খিঁচুনি, অসআবিক চলাফেরা, দাঁত কড়মড় করা, বর্সক্ষণ কোনো কিছু চাটা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। রোগের প্রকোপ বাড়লে পক্ষাঘাত হয়ে পশু মারা যায়। রোগের চিকিৎসায় গ্লুকোজ নরমাল সেলাইন ইনজেকশন দিতে হয়। তবে রোগ ধরা পড়ার সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করাতে হবে।

## গরুমহিষের রোগ প্রতিরোধ বা ভেক্সিনেশন সিডিউল

| টিকা বীজ | প্রয়োগ স্থান | রোগ প্রতিরোধ মেয়াদ | মন্তব্য | বাছুরের পরিচর্যা |
|---|---|---|---|---|
| তড়কা | চামড়ার নীচে | ১ বৎসর | ১ বৎসর পর পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে। | ৬ মাস বয়সে বাছুরকে রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে। |
| গলাফুলা | ঐ | ৬ মাস | ৬ মাস পর পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে। | |
| বাদলা | ঐ | ৬ মাস | ৬ মাস পর পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে। | |
| ক্ষুরা রোগ | গলার দুপাশে চামড়ার নীচে মাংসপেশিতে | ৪/৬ মাস | প্রথমটিকার ৪ সপ্তাহ পর পুনঃ প্রয়োগ করলে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। | বাছুরের জন্য কৃমি রোগের ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। |
| গো-বসন্ত | ঐ | ১ বৎসর | প্রথম টিকাদানের ১ বৎসর পর পুনঃটিকা প্রয়োগ প্রয়োজন। | সঠিকভাবে সুষম খাদ্য প্রদান করতে হবে। |
| জলাতংক (কামড়ানোর পূর্বে) | | ১ বৎসর | গরুঅসুস্থ হলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। | |

## ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র প্রস্তুত ও পশুকে খাওয়ানো

- ❖ওইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র তৈরীর জন্য শতকরা ৮২ভাগ খড়, ১৫ভাগ মোলাসেস (লালী/ঝোলাগুড়) এবং ৩ভাগ ইউরিয়া সার প্রয়োজন।
- ❖ প্রথমে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ খড়, ঝোলাগুড় ও ইউরিয়া মেপে নিতে হবে।
- ❖ উদাহরণ ঃ ১০কেজি ইউরিয়া মিশ্রিত খড় তৈরীর জন্য ২কেজি লালী,৩০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৬-৭ লিটার টিউবওয়েলের পানি প্রয়োজন।
- ❖ শুকনো খড়কে (১০কেজি) পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে রাখতে হবে। এর পর নির্দিষ্ট পরিমাপের ইউরিয়া (৩০০গ্রাম) ও ঝোলা গুড় (২কেজি) নির্দিষ্ট পরিমাণ পানিতে (৬লিটার) ভালভাবে মিশিয়ে আস্তে আস্তে ঝরনাবা হাত দিয়ে খড়ের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে।
- ❖ ইউরিয়া মোলাসেস সলুশন ছিটানোর সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় সলুশনের পানি সম্পূর্ণ চুষে নেয়। এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে ও ইউরিয়া মোলাসেসের সলুশন ছিটিয়ে সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ওজন করা সম্পূর্ণ খড়ের সাথে সম্পূর্ণ ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রিত সলুশন নিলেইওইউরিয়া মোলাসেস স্ট্রপ্রস্তুত করা সম্পন্ন হবে এবং গরুকে এই প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানোর উপযোগী হবে।

**সুবিধাসমূহঃ**

- ❖ এই পদ্ধতিতে ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড়কে পলিথিন ব্যাগে ৭-১০দিন আবদ্ধ অবস্থায় রেখে রৌদ্রে শুকানো প্রয়োজন হয়না।
- ❖ এই পদ্ধতিতে ইউরিয়া পক্রিয়াজাত করার সঙ্গে সঙ্গে সব ধরনের (বাড়ন্ত, দুগ্ধবর্তী, গর্ভবতী ইত্যাদি) গরুমহিষকে তাদের চাহিদামত খাওয়ানো যায়।

- ❖ এই ইউরিয়া মিশ্রিত খড়ের পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্য পশুকে খাওয়ানো যায়। যেমন- কাঁচাঘাস, ভুষি, খৈল ইত্যাদি। পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এমন হাড্ডিসার গরুকেইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র নিয়মিত খাওয়ালে গরুদ্রুত মোটাতাজা হয়।

**সাবধানতা**

- ❖ ইউরিয়া,মোলাসেস, খড় ও পানি অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবেনা। ইউরিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করলে বিষক্রিয়ায় পশু মারা যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।
- ❖ এই পদ্ধতিতে খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখা বা খাওয়ানো যাবেনা। কারণ এসময়ের পর খড়ে ইউরিয় ও লালি গুড়ের পরিমাণ কমে যায়।
- ❖ **একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গরুকে প্রত্যহ ৫০ গ্রামের অধিক ইউরিয়া মিশ্রিত খড় (১.৬৭ কেজি) খাওয়ানো উচিত নয়। !!!!**
- ❖ ছয় মাসের কম বয়সী গরু-মহিষ এবং গর্ভবতী গাভীর গর্ভাবস্থায় শেষ পর্যায়েইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র খাওয়ানো যাবেনা।

## ইউরিয়া বিষক্রিয়া

সাধারণত খড়কে শতকরা ৪ভাগ ইউরিয়া পক্রিয়াজাত করে রোমন্থক পশুকে মোটাতাজাকরণের জন্য খাওয়ানো হয়। তবে অনভ্যস্ত পশুর খাদ্যে হঠাৎ করে ইউরিয়া সংযোগ করলে বা খাদ্যে আকস্মিক অতিরিক্ত ইউরিয়া অথবা ত্রূটিপূর্ণভাবে ইউরিয়া মিশ্রিত হলে পশুর বিষক্রিয়া হয়।

**লক্ষণ**

- ❖ গরুকে সাধারণত এইরূপ ইউরিয়া মিশ্রিত খড় খাওয়ানোর ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে উপসর্গ প্রকাশ পায়।
- ❖ পেটে ব্যথা, ফেণাযুক্ত লালা ঝরা,মাংসপেশীর কম্পন, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, পেটফাঁপা ও হাটতে অসম্মতি উপসর্গ দেখা দেয়।

**বিষক্রিয়া নির্ণয়**

- ❖ ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খাদ্য খাওয়ানোর ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপসর্গ দেখে ইউরিয়া বিষক্রিয়া নির্ণয় করা যায়।
- ❖ ইউরিয়া বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসে এ্যামোনিয়ার গন্ধ থাকবে।

**চিকিৎসা**

- ❖ অ্যাসেটিক অ্যাসিড ৫% বা ভিনেগার ০.৫-১.০ লিটার মেষ ও ছাগল এবং ২-৪ লিটার গরুও মহিষকে খাওয়াতে হবে।
- ❖ চিকিৎসার পর পুনরায় উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসার ২০ মিনিট পর পুনরায় এই ঔষধ খাওয়াতে হবে।
- ❖ ডিহাইড্রেশনের জন্য ২-৪ লিটার ৫% ডেক্সট্রোজ-স্যালাইন শিরায় উনজেকশন দেয়া যায়।

## সাইলেজ এর মাধ্যমে খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ

এলাকায় পুষ্টিকর সবুজ গো খাদ্যের অভাব রয়েছে, ফলে গবাদি পশু হতে দুধ ও মাংসের উৎপাদন খুবই কম এবং প্রতিটি গাভীর গড় বাচ্চাদানের সংখ্যাও আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে লক্ষ্যভুক্ত বসত বাটিতে প্রচলিত প্রধান গো-খাদ্য খাদ্যমান বৃদ্ধি ও সহজ পাচ্য করার উদ্দেশ্যে সহজ পদ্ধতিতে খড় প্রক্রিয়াজাত করে প্রকল্পভুক্ত গবাদি পশুকে নিয়মিত খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

**পদ্ধতি**

মোট খড়ের ওজনের শতকরা ৫ভাগ ইউরিয়া,খড়ের ওজনের সমপরিমাণ পানির সাথে ভালভাবে গুলানোর পর ইউরিয়া মিশ্রিত পানি কড়ের সাথে সমভাবে ছিটিয়ে মেশাতে হবে। (অর্থাৎ প্রতি ১০০ কেজি খড়ের ৫কেজি ইউরিয়া সার ও ১০০লিটার পানি)। ইউরিয়া পানি মিশ্রিত খড় সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় কোন পাত্রে অথবা মাটির গর্তে ৭-১০ দিন পলিথিন, চট,ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে চাপা দিয়ে রাখতে হয়। যাতে কোন ক্রমেই বাইরের বাতাস বা বৃষ্টির পানির সংস্পর্শে  না আসে। ইউরিয়া খড়ের মিশ্রণ এভাবে ৭-১০দিন সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখার পর গবাদি পশুকে খাওয়ানোর উপযোগী হয়। পশু প্রাথমিকভাবে প্রক্রিয়াজাত খড় খেতে সামান্য আপত্তি করতে পারে। কিন্তু ২-১ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে যায়। ৭-১০ দিন সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় থাকলে খড় নরম ও সহজ পাচ্য এবং ইউরিয়া হতে এ্যামোনিয়া নির্গত হয়ে খড়ের সাথে মিশে যায়। এই এ্যামোনিয়া গবাদি পশুর পাকস্থরীতে বসবাসকারী কীট বা মাইক্রোফ্লোরা  আমিষ জাতীয় খাদ্যে রূপান্তরিত করে পশুর আমিষ জাতীয় কাদ্য ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে।

প্রকল্প এলাকায় সদস্য বসতবাড়ীতে বন্যা মুক্ত স্থানে পাশাপাশি ২টি ১মিটার ব্যাস (৩ফুট ৩ইঞ্চি) ও ১ মিটার গভীর (সামান্য চালু রেখে) মাটিতে গর্ত করে নীচের দিকটা ভাল করে পিটিয়ে দরমুজ করে সমান করে নিয়ে ২ ইঞ্চি (বালি খোয়া ও সিমেন্টের মিশ্রণ দিয়ে) ঢালাই করে নিতে হবে এবং গর্তের পার্শ্বে ১ ইঞ্চি প্লাষ্টার ও উপরের অংশে ১ মিটার ব্যাসের রিং ফরমা বসিয়ে মাটির উপরে জেগে থাকা অংশ (৪ ইঞ্চি-৬ ইঞ্চি) সিমেন্ট,বালি ও খোয়ার মিশ্রন দিয়ে নকশা অনুযায়ী ঢালাই করে শক্তিশালী করতে হবে যাতে কাজের সময় গর্তে ওঠানামা করাতে ভেঙ্গে না যায়। পরিশেষে গর্তের ভিতরের অংশের দেওয়াল ও মেঝে সিমেন্ট পানির প্রতিবারে আনুমানিক ৬০-৭০কেজি খড় প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব,সাধারণত এরূপ ২টি গর্তের প্রয়োজন হয়। কোন সদস্য বাটিতে বেশী সংখ্যক গবাদি পশু থাকলে প্রয়োজন অনুসারে গর্তের আকার ও গভীরতা বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত পরিমাণ খড় প্রক্রিয়াজাত করা যেতে পারে।

নকসা

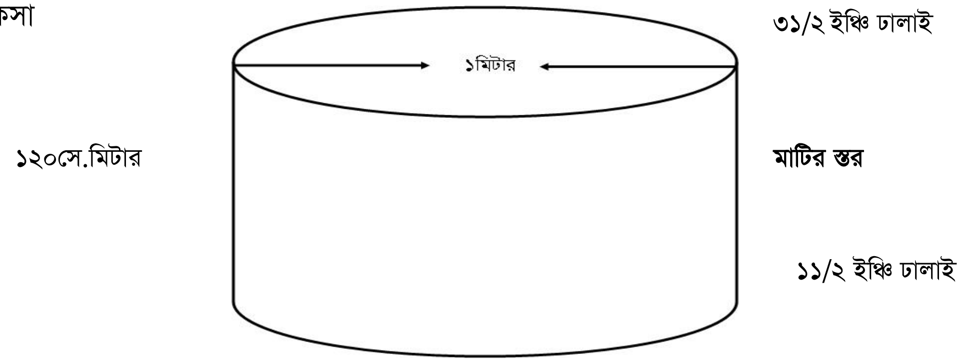


-----